ভূমিকা

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভের কাছে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় এক সর্বজনবিদিত ঘটনা। একটি সফল ষড়যন্ত্রের ফলে নবাব পরাজিত হন। কিন্তু ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাংলার নবাব মীরকাশিম,অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘলসম্রাট শাহ আলমের সম্মিলিত বৃহৎ বাহিনী ক্যাপ্টেন মনরোর ক্ষুদ্র বাহিনীর কাছে পরাজিত হয় তখন তা সর্বার্থেই সামগ্রিক পরাজয়, কোনো ষড়যন্ত্রের কূটনৈতিক চালের অসহায়তা নয়। এই বিপর্যয় শুধু উন্নত রণকৌশল ও সমরাস্ত্রের কাছে হীনশক্তি সৈন্য দলের পরাজয় নয়--- সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়ই এই শোচনীয় পরিণামের জন্য দায়ী। এরপর বাংলার রাজনীতিতে দ্রুত পটপরিবর্তন ঘটতে থাকে-- নবাবের হাত থেকে সার্বভৌমত্ব ক্রমশ চলে যায় ইংরেজদের হাতে। অযোধ্যার নবাব কোম্পানীর অনুগত মিত্রে পরিণত হন, নামসর্বস্ব মুঘল সম্রাট কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হন।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও ক্রমশ কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবল পরাক্রান্ত মহীশূর, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও 'হিন্দু পাদ পাদশাহী'র দাবিদার মারাঠাগণ ও পরে অসমসাহসী শিখগণ, সকলেই কালক্রমে ইংরেজদের দ্বারা বিজিত হয়। অন্য দেশীয় রাজ্যগুলিও ক্রমে ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত হয়। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে এত বিশাল একটি দেশ, বিপুল যার জনসংখ্যা এবং অপরিমিত যার প্রাকৃতিক সম্পদ— সেই দেশ কি করে কয়েক সহস্র মাইল দূরবর্তী একটি ছোট দ্বীপবাসী জাতির অধীনে এমন সমগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করল। আত্মবিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর কারণ সামরিক নৈপুণ্যের অভাব নয়। দেশের পরাক্রমশালী শক্তিবর্গের ভিতর পরস্পর বিভেদ, বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা, প্রতিবেশী বা প্রতিদ্বন্দ্বীর সর্বনাশের জন্য বহুক্ষেত্রে ইংরেজের সাহায্য গ্রহণ, কূটনৈতিক বুদ্ধির অভাব, মুঘল সম্রাট ও অযোধ্যার নবাবের অপদার্থতা এবং সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর কোনো দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ইত্যাদির ফলে দেশ ইংরেজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধীন হয়। রাষ্ট্রশক্তির পরিচালকবর্গের এই শোচনীয় অধঃপতন ছাড়াও ছিল সমাজের পশ্চাৎপদতা ও অবক্ষয়। সবটাই ঘটে প্রধানত বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে, কূপমণ্ডুকতা ও দ্বৈপায়নিক মনোভাবের (insularity) দরুণ। প্রায় ছয় শতাব্দী পূর্বেও (১১৯২ খ্রীষ্টাব্দ) দেশ বহিরাগত শক্তি ও সভ্যতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ঠিক এই কারণ গুলির জন্যই আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। অথচ এইবার ভারতীয়দের বিজেতারা ছিল আক্ষরিকভাবে দ্বীপবাসী, কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের ইংলণ্ডবাসীর মতো অদ্বৈপায়নিক জাতি আর দেখা যায়নি।[১]

ব্রিটিশ শাসন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গদেশে। সেই সূত্রে বাঙালিরা প্রথম ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে। শাসন প্রণালীর নতুন ও অন্যতর আদর্শ,

বৃহৎ কারবার ও বাণিজ্য ব্যাপারের উদ্যমশীল সংগঠন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অন্যবিধ রূপরেখা— এই সবই তৎকালীন বাঙালি সমাজ মানসে এক প্রবল অভিঘাতের সৃষ্টি করে এবং নতুন ধরণের এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর জন্ম হয়। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ও ইউরোপীয় সংসর্গের সূত্র ধরে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে কয়টি আধুনিক ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয় তার অন্যতম হচ্ছে নারী উন্নয়ন সমস্যা। অবশ্য পাশ্চাত্ত্যেও নারীসমস্যা সম্বন্ধে ব্যাপক সচেতনতা খুব বেশি পুরাতন নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা পশ্চিমের নারী মুক্তি ভাবনার এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করতে পারি।

সুবিখ্যাত এথেনীয় সভ্যতায় নারীর স্থান ছিল অন্তঃপুরে এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীনতা ও অন্যান্য সুযোগের অভাবে তাঁদের জীবন ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের। এই মননহীন নারী, এতএব, মননসমৃদ্ধ সূক্ষ্মরুচি গ্রীকপুরুষের প্রেমিকা হবারও যোগ্য নয়। প্লেটো বলেন, মেয়েরা শিশু, অপরিণতবুদ্ধি, দুর্বল ও পশুর সমগোত্রীয়। ডিমস্থিনিস বলেন, "আমরা বিবাহ করি বৈধ সন্তানদের জন্য এবং বিশ্বস্ত গৃহরক্ষকের জন্য।"[২] অ্যারিস্টটল মনে করেন মেয়েদের পক্ষে চতুরতা বা পুরুষোচিত ভাব একেবারে অনুচিত। এই ধরণের নারীচরিত্র সৃষ্টি করার জন্য তিনি ইউরিপাইডিসের নিন্দা করেন। পেরিক্লিস বলেন, মহিলারা যত কম প্রকাশ্যে আলোচিত হন ততই তাঁরা সম্মানীয়। সুতরাং গ্রীক সভ্যতার উজ্জ্বল প্রতিনিধিদের মধ্যে কোনো নারী নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম কবি সাফো। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের সমাজে রূপ, বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যা এবং ললিতকলাসমৃদ্ধ বহু মেয়ে ছিলেন, তাঁদের বলা হত হেটিরা --তাঁরা গৃহবধূ নন, গণিকা। তাঁরাই সেকালের চিন্তাবিদ বা রাষ্ট্রনায়কদের প্রণয়িনী ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন যুগের পরে মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের প্রভাবে মাঝারি বা বিশাল সামন্ত ভূম্যধিকারীরূপে বহু মহিলা ইউরোপে প্রকৃত অর্থে ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। সৃজনশীল সংস্কৃতিচর্চা ও কাব্যরচনা করে সে যুগের কিছু মহিলা নারী-প্রগতিতে এক বিশিষ্ট মাত্রা যোগ করেন। এযুগের বিখ্যাত ত্রুবাদুর কবিদের মধ্যে মহিলা কবির সংখ্যা নগণ্য নয়। শ্রোতা এবং শিল্পী দুই হিসাবেই মেয়েরা গাথাকাব্য আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং রাষ্ট্রশক্তির পরাক্রমের ফলে সামন্তপ্রথা দুর্বল হতে থাকে। অভিজাত সামন্তনারীর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ক্রমে বিলুপ্ত হয়।[৩] কিন্তু সাধারণ মেয়েদের জীবন ছিল দুঃখের। নানারকম কঠোর শ্রম ও বিশৃঙ্খল উপায়ে তাদের জীবিকা অর্জন করতে হত। উপরন্তু ছিল উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারি অভিজাতদের দৌরাত্ম্য। রেনেসাঁস যুগে নারীর গৃহস্থালি রূপকে বিশেষ সম্মানজনক মনে করা হতে থাকে এবং প্রাচীন এথেন্সের অনুকরণে অন্তঃপুরবদ্ধ নারী আদর্শকে সাহিত্যে গৌরবান্বিত করা হয়। মেয়েদের পক্ষে তিনটি গুণ সবচেয়ে শ্লাঘনীয় বলে বিবেচিত হয়-- সতীত্ব (chastity), শালীনতা (modesty) এবং মাধুর্য (charm)। ঘরোয়া গৃহপালিত নারীর স্বাধীনতা ক্রমে যথেষ্ট খর্ব হয়ে যায়।

রেনেসাঁস, ভৌগোলিক আবিষ্কার, বাণিজ্য বিপ্লব, বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ ইত্যাদির মাধ্যমে পঞ্চদশ শতক থেকে পশ্চিম ইউরোপ ও ইংলণ্ডের সমাজ

জীবনে ক্রমিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সপ্তদশ শতকের মননবিপ্লব অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানালোক বা Enlightenment এ পরিণতি লাভ করে। Reason বা যুক্তিবাদের প্রতি নিরঙ্কুশ আস্থা ও মানুষের অধিকার সম্বন্ধে প্রগাঢ় সচেতনতা এই সময়ের মনীষীদের চিন্তা ভাবনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই ভাবনাগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সমগ্র সমাজ-গঠনকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করে কৃষি ও শিল্পবিপ্লব। এই দুই বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে ইংলণ্ডের কৃষিজীবী পরিবারের চিত্র ছিল এই রকম--

Man, to the Plough ,
Wife, to the cow ,
Girl, to the yarn ,
Boy, to the barn.৪

কিন্তু কৃষি ও শিল্পবিপ্লবের পরে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে পরিবারের এই চিত্র অনেকক্ষেত্রেই অন্যরকম হয়ে যায়।

মূলধনী কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন ও কলকারখানার প্রসারের ফলে উভয় ক্ষেত্রেই বহু নারী শ্রমিক নিযুক্ত হন এবং এই প্রথম মেয়েরা নিজ পরিবার বা ঘর থেকে বহুদূরে দিনের অনেকগুলি ঘন্টা অতিবাহিত করতে থাকেন । এই ঘটনা পরিবার জীবনের বহু শতাব্দী প্রাচীন কাঠামোকে অনেকখানি পরিবর্তিত করে দেয় এবং পরিবারের অন্তর্গত নারী-পুরুষ সম্পর্ককে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। কর্মরত নারী শ্রমিকের নিজস্ব উপার্জন বহু ক্ষেত্রে পরিবারে তার অবস্থানের পরিবর্তন সাধন করে এবং শ্রমিক নারীর এই 'স্বাধীনতা' ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে তাকে অন্যদের কাছেও ঈর্ষণীয় করে তোলে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বা ব্রন্টি ভগ্নীদ্বয় অনুভব করেন যে সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছেও এঁরা দৃষ্টান্তস্থল হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। নারীর ব্যক্তিত্ববিকাশের অধিকারের কথা ব্রন্টি ভগ্নীদ্বয় তাঁদের রচনায় ব্যক্ত করেন। অপরদিকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে(১৮৫৪-৫৬) সৈন্যদের সেবাকার্যে অসামান্য নৈপুণ্য ও কার্যকারিতা প্রদর্শন করে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মেয়েদের জন্য নার্স-এর পেশাগ্রহণ ও সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণের দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। পরিবারের পুরুষ রক্ষাকর্তার উপর একান্ত নির্ভরশীল এবং শ্রমহীন নারীসৌন্দর্যের যে ধারণা ইতিপূর্বে ব্রিটিশ সমাজে আদৃত ছিল, ক্রমে সেই ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত পরিবারেও বিশেষত অবিবাহিত মেয়েদের স্বনির্ভরতার আদর্শ এখন সমাজে গুরুত্ব লাভ করতে থাকে।[৫]

জীবনযাপন পদ্ধতির এই পরিবর্তন ছাড়াও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল-- সেটি হল নারীমুক্তিবিষয়ক তাত্ত্বিক ভাবনা। পঞ্চদশ শতক থেকেই মেয়েরা স্বাধীনতা হরণের ক্রমিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় সরব হতে থাকেন। নারী ভাবনার প্রথম সচেতন নারী প্রবক্তা ক্রিস্টিন ডি পিসাঁ ছাড়াও আরো বহু মহিলা পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে তাঁদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন।[৬] অতঃপর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মেরী ওলস্টোনক্রাফ্ট রচিত Vindication of the Rights of Woman

নামক গ্রন্থটি। এই গ্রন্থ নারীর অধিকার ও নারীবাদী দর্শনের প্রথম বিস্তারিত দলিল। গ্রন্থটিতে মেরী নারীর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণের বন্যায় মেরীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঠেলে দেওয়া হয় এবং অবহেলিত মেরী পুনরাবিষ্কৃত হন শতাধিক বছর পরে এমা গোল্ডম্যান কর্তৃক। মেরী ওলস্টোনক্রাফটের গ্রন্থটি ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়। দার্শনিক রুশো মানুষের জন্য প্রথম সাম্য ও গণতন্ত্রের বার্তা প্রবলভাবে ঘোষণা করে পশ্চিমী জনমানসে বিদ্যুৎ সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু এই সাম্য,স্বাধীনতার দাবি ছিল শুধু পুরুষের জন্য। মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ ছিল ভিন্ন। তিনি বলেন মেয়েদের কর্তব্য হচ্ছে পুরুষদের তৃপ্তিবিধান করা এবং বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা না করা। তিনি আরো বলেন মেয়েরা স্বজ্ঞা (intuition) দ্বারা চালিত, যুক্তিবাদ অনুসরণে ব্যর্থ এবং বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় সম্পূর্ণ অক্ষম । কিন্তু তারা পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যৌন মনোহারিত্বের দ্বারা এবং যে পরিমাণে এই মনোহারিত্ব প্রয়োগে তারা ব্যর্থ ঠিক সেই অনুপাতে পুরুষ তাদের প্রভু হয়। রুশোর মতবাদের খণ্ডন ও জোরালো প্রতিবাদ করে ওলস্টোনক্রাফট জানান যে এই তত্ত্ব কামোদ্দীপকতার দর্শন এবং নৈতিকতা, যুক্তি ও সম্ভ্রম— যা কিছু মানবজীবনের উৎকর্ষসাধনের সহায়ক-- তার পরিপন্থী। আইন, সামাজিক প্রথা, শিক্ষা এই সবের দ্বারা এই ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে এবং মেয়েদেরও পরাধীনতাকেই ভাগ্য বলে মেনে নিতে বাধ্য করেছে।[৭]

নারীর পরাধীনতার কারণ ও প্রতিকারের উপায় বিশ্লেষণ করে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় জন স্টুয়ার্ট মিল এর Subjection of Women. উদারনৈতিক মতের পৃষ্ঠপোষক এই চিন্তাবিদ মনে করেন বৈষম্যমূলক আইনবিধির জন্যই মেয়েরা চিরদিন বঞ্চিত ও নির্যাতিত হয়। সুতরাং নারীর পরাধীনতামূলক সমস্ত আইনের উচ্ছেদ করে নারীকে পুরুষের সমান নাগরিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার (বিশেষত শিক্ষা, সম্পত্তি ও ভোটের অধিকার) প্রদানই হচ্ছে নারীমুক্তির পথ। উনবিংশ শতকের নারীবাদী আন্দোলনকারী মানুষের কাছে Subjection of women গ্রন্থটি অপরিসীম গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়।

উদারপন্থী নারীবাদী চিন্তাধারার সমান্তরাল গড়ে ওঠে মার্ক্সবাদী ভাবনা। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস The()rigin of the Family, Private Property and the State (1884) গ্রন্থে বলেন আদিম মানবসমাজে মেয়েদের প্রভুত্ব বা সমানাধিকার ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও ধনতন্ত্রের সূত্রপাতে মাতৃতন্ত্রের পতন ঘটে ও পৃথিবীব্যাপী নারীদমন প্রথা প্রবর্তিত হয়। সুতরাং সম্পদ ও জীবিকার জন্য পুরুষের সঙ্গে সমান সুযোগের সাহায্যে নয়, উৎপাদনযন্ত্রের সমাজতন্ত্রীকরণ এবং সকলের জন্য জীবিকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই নারীমুক্তি সম্ভব। আগস্ট বেবেল Women and Socialism (1879) এবং Woman in the Past, Present and Future গ্রন্থের মাধ্যমে নারীর ঐতিহাসিক পরাধীনতার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন এবং ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাহায্যেই একমাত্র নারীমুক্তি সম্ভব বলে মনে করেন।

নারীমুক্তি সম্বন্ধে এইরকম তাত্ত্বিক আলোচনা ও দর্শননির্মাণের পাশাপাশি শুরু হয়েছিল একটি অধিকার আদায়ের লড়াই। ফরাসী বিপ্লবের Declaration of the Rights of Man এর (১৭৮৯) প্রত্যুত্তরে ওলিম্প্ দ্য গস প্রকাশ করেন Declaration of the Right of Woman এবং পুরুষদের সমস্ত বিশেষ সুবিধার অবসান দাবি করেন। ওলিম্প দ্য গস অচিরেই গিলোটিনে নিহত হন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অ্যামেরিকার ঐতিহাসিক সেনেকা ফল্‌স সম্মেলনে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং Declaration of Sentiments গৃহীত হয়। সমান শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ, বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আইনমাফিক অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, ভোটাধিকার ইত্যাদি দাবি এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। ভোটাধিকার আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। ইংলণ্ডে সারা ও এমিলি প্যাংকহার্স্টের নেতৃত্বে মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলন সরকারী নিপীড়ন সত্ত্বেও বৃদ্ধি পায়। এই উদ্দেশ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে বৃহৎ গণমিছিল হয় তাতে তৎকালে ইংলণ্ডবাসী যেকয়জন ভারতীয় মহিলা অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে সরলা রায় ছিলেন অন্যতম। প্যাংকহার্স্ট আন্দোলনের ফলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিশোর্ধ্ব মহিলা এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সব প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ভোটাধিকার লাভ করেন। আমেরিকার মেয়েরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও শুরু করেন। এদিকে মননশীল যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভার্জিনিয়া উলফ্ A Room of One's Own গ্রন্থে (১৯২৯) প্রমাণ করেন যে নারী-প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়ের কারণ নিহিত আছে সমাজের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পশ্চিমী পৃথিবীতে নারীবাদী দর্শন নির্মাণে এক ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে। এর সূত্রপাত ঘটান সিমোন দ্য বোভোয়া, অসামান্য গ্রন্থ 'দি সেকেণ্ড সেক্স (১৯৪৯) রচনা করে। বেটি ফ্রিডান এর 'দি ফেমিনিন মিস্টিক', জার্মেইন গ্রীয়ার-এর 'দি ফিমেল ইউনাক', কেটি মিলেট-এর 'দি সেক্সুয়াল পলিটিক্স', জুলিয়েট মিচেল-এর 'উয়োম্যানস এস্টেট', ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে নারীবাদী দর্শন এক অসাধারণ নতুন মাত্রা অর্জন করে। জার্মেইন গ্রীয়ার এর মত অনুযায়ী পূর্বতন নারী আন্দোলন ছিল সংস্কার পন্থী কিন্তু এখন এই আন্দোলন হয়ে উঠেছে বৈপ্লবিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারের সূত্রে এদেশের তরুণগণ পশ্চিমের ভাব আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থ মারফৎ পরিচিত হন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ ভলটেয়ার, রুশো, মিল, টমাস পেইন ইত্যাদির গ্রন্থ সমূহের তত্ত্বাবলীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বিশেষত পেইন এর Rights of Man এবং মিল-এর Subjection of Women দ্বারা যুবকগণ গভীরভাবে প্রভাবিত হন। কিন্তু মেরী ওলস্টোনক্রাফ্‌ট তাঁদের নিকট অপরিচিত থকেন। এই যুবকগণ অনেকেই পশ্চিমের উদারনৈতিক আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু পশ্চিমের উৎপাদনমুখী বুর্জোয়া অর্থনীতি থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন থাকেন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যাধীন কাঠামোর ভিতর তাঁরা মানুষের জন্য বিবিধ অধিকার ও সমাজে আধুনিকতা প্রতিষ্ঠার কথা (অবশ্য উচ্চবর্গীয় সমাজে) চিন্তা করেন-- কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি, প্রভূত উদ্যমশীল বাণিজ্য কিংবা শিল্পোৎপাদনের বহুমুখিতা থেকে তাঁরা বহুদূরে অবস্থান করেন। উৎপাদন ব্যবস্থার

সঙ্গে সম্পর্করহিত, বিদেশী শাসকের ঔপনিবেশিক স্বার্থ-পরিচালিত শাসন কাঠামোর নিয়ন্ত্রণাধীন এই ভাব-আন্দোলন ঊনবিংশ শতকের সংস্কারপন্থীদের চিন্তা ও কর্মকে অনেকখানি সীমাবদ্ধ করে রাখে।

এই সীমাবদ্ধতাকে মনে রেখেও বলা যায় ঊনবিংশ শতকের বঙ্গদেশের সমাজে বিভিন্ন দিকে উল্লেখযোগ্য প্রগতিপন্থী পরিবর্তন ঘটে। ফলে সমাজের চেহারা ও চরিত্রের এক বিরাট রূপবদল ঘটে। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নারীর সামাজিক দুর্দশা সম্বন্ধে বেদনা বোধ এবং সেই দুর্গতি নিরাকরণের জন্য প্রায় সমস্ত সমাজ সংস্কারকের বিশেষ প্রয়াস। কিন্তু এই সংস্কার প্রচেষ্টার প্রেরণা শুধুমাত্র পশ্চিমের ভাবাদর্শপুষ্ট ইংরেজি শিক্ষিত যুবকরাই অনুভব করেননি, সংস্কৃত কলেজে শিক্ষিত ও সংস্কৃত পণ্ডিত হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজের একটা অংশও সমান বা অধিকতর উদ্যমে এই প্রয়াসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। নারীর মর্যাদার ক্রম অবমূল্যায়নের পিছনে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দায়ী ছিল, ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও জনমত গঠিত হতে থাকে। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা, সভা-সমিতি, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ রচনা ও পুস্তিকার মাধ্যমে সংস্কারপন্থীগণ সমাজকে প্রভাবিত করতে থাকেন। প্রথমে এই আন্দোলন কলকাতায় শুরু হলেও ক্রমশ দূর মফস্বল এবং গ্রামেও তার স্পর্শ লাগে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন পুরুষরা। কিন্তু সংস্কারপন্থী পরিবার, কখনো বা অন্য পরিবারের মেয়েরা নিজেরাও মনের মধ্যে 'নবজাগরণের' চাঞ্চল্য অনুভব করেন। এর স্পষ্ট প্রকাশ অনুভূত হয় তাঁদের লেখা আত্মকথায়। ভাবগ্রাহিতা ও প্রকাশক্ষমতায় নারীর মন যে সমান সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে বাঁধা থাকতে পারে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই আত্মকথাগুলি। মেয়েদের মনন ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত হীন ধারণার এগুলি মূর্ত প্রতিবাদ। এই আত্মকথা কিংবা স্মৃতিকথাগুলি শুধু নারীর অন্তর্লোকের প্রতিচ্ছবিই নয় বাইরের সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তার নিজস্ব প্রতিক্রিয়ারও ইতিহাস। সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের পাঠকের কাছে এগুলির গুরুত্ব অসামান্য। সমকালকে ধারণ করেও এগুলি প্রায়শ বলিষ্ঠ চেতনায় সমকালকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছে।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দুটি দশক বিশেষভাবে জাতীয় জাগৃতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্পৃহার সংগ্রামে ব্যাপৃত হয়। ফলে সমাজ সংস্কার আন্দোলন নিষ্প্রভ হয়ে আসে। নারী জাগরণের প্রবক্তাদের মনোযোগও রাষ্ট্রিক চেতনার স্রোতে ধাবিত হয়। কিন্তু যে স্রোতের উৎসমুখের বাধা আগেই খানিকটা অপসারিত হয়েছিল সেই স্রোত আপন গতিতেই পথ করে নিতে থাকে। মেয়েরা নিজের শক্তিতে আস্থা ফিরে পাচ্ছিলেন এবং সমাজের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করতে অনেকেই সাহসী হয়েছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে মেয়েরাও জাতির সম্মান পুনরুদ্ধারের কাজে পিছিয়ে রইলেন না। মনের মুক্তি, 'ঘরে'র মুক্তি অর্জন করে অনেক মেয়ে 'বাইরে'র মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে মেয়েদের ব্যাপক অংশগ্রহণ আন্দোলনটিকে একেবারে অন্দরমহলে নিয়ে আসে। এরপর স্বাধীনতা সংগ্রামের অর্থ বদলে যায়। বিভিন্ন পর্বে এই

সংগ্রাম (অহিংস বা সশস্ত্র) বস্তুত সমগ্র সমাজের সংগ্রামে পরিণত হয়। মেয়েদের পক্ষে জাতীয় সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে নারী মুক্তি আন্দোলনের বৃহত্তর পর্যায়।

বৈদিক যুগে মেয়েদের শিক্ষার এবং অবিবাহিত থাকার অধিকার ছিল। সংহিতা, স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ থেকে মেয়েদের বিভিন্ন অধিকার খর্ব করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। শিক্ষার অধিকার না থাকায় সাধারণ কোনো বৃত্তির অধিকারও থাকে না। সুতরাং জীবনের প্রতি পর্বেই মেয়েরা কোনো না কোনো পুরুষের উপরে একান্ত নির্ভরশীল হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। ক্রমশ মেয়েরা অধিকারহীন ব্রাত্য এক বৃহৎ নরগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। মধ্যযুগে মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম এদেশে প্রবেশ করে। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে ইসলাম ধর্ম নারীর প্রতি উদার হলেও এদেশীয় মুসলিম শাসক শ্রেণী মেয়েদের সেই অধিকার ক্রমেই হরণ করেন। এইভাবে হিন্দু মুসলিম উভয় শ্রেণীর নারীই জীবনে শুধু দুটি কর্তব্য পালনে বাধ্য ছিল। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং সন্তানের (বিশেষত পুত্রসন্তানের) জননী হওয়া। এইভাবে শিক্ষা ও স্বাধীনতা বঞ্চিত অন্তঃপুরবদ্ধ নারীসমাজকে পঙ্গু করে রাখা হয়। ঊনবিংশ শতকের নারী-উন্নয়ন প্রয়াসের দ্বারা ক্রমশ বঙ্গ নারী কিছু কিছু অধিকার ফিরে পেতে থাকে। এই প্রয়াস একান্তভাবে সংস্কারপন্থী পুরুষ পরিচালিত এক আন্দোলন। লেখাপড়া না জানা, স্বাধীনতাহীন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরুষনির্ভর মেয়েদের অধিকার আদায়ের জন্য পুরুষরা ছাড়া আর কে আন্দোলন করবে?

কিন্তু এতদিনকার অধিকারহীনতা বিষয়ে মেয়েরা কি নির্বিকার ছিল? তাদের ভিতর কি আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-বিরহ, জীবন-জীবনপ্রেমের বাসনা বহমান ছিল না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে প্রচলিত লোকসঙ্গীত, ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং রূপকথা, ব্রতকথা ও ছড়ার মধ্যে। এই বিস্তীর্ণ সাহিত্যের অনেকটাই নারীরচিত এবং এগুলির মধ্যে বহু প্রতিবাদ ও বেদনা যেমন পুঞ্জীভূত আছে, তেমনি আছে জীবন-যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগময় অভিব্যক্তি। নাম-না-জানা মেয়েদের হাতে গড়া এই নারীসাহিত্য আধুনিককালে ভিন্ন রূপে দেখা যায় স্বনামে প্রকাশিত নারী আত্মকথাগুলিতে। বাংলায় প্রথম আত্মকথার রচয়িতা যে একজন নারী-- এ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

কিন্তু এই বিপুল নারী সাহিত্য সত্ত্বেও এবং এত অধিকারবৈষম্য, বঞ্চনা সত্ত্বেও এদেশে নারীমুক্তিবিষয়ক কোনো নারীদর্শন গড়ে ওঠেনি। যুগ যুগ ধরে শিক্ষা ও স্বাধীনতাবঞ্চিত এদেশের নারী সমাজ অবরোধের অন্তঃপুরে শুধু শারীরিক বন্দীত্বের শিকারই হয়নি, অবরোধদশা তাদের মনের উপরেও একটা গাঢ় মলিন পর্দা ফেলে দেয়। ইউরোপের মেয়েদের অবরোধহীন জীবন, সামাজিক মেলামেশা, অল্পবিস্তর লেখাপড়া-- এই সবেরই সুযোগ কিছু পরিমাণে প্রায় সর্বদা বর্তমান ছিল। পুরুষ নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগের অধিকারবৈষম্য সেখানকার মেয়েদের বহুপূর্বে সচেতন করে ও মেয়েদের প্রাপ্য অধিকার বিষয়ে সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় দর্শন গড়ে

ওঠে। সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডেই লেডী উইনচেলসী ও অ্যাফ্রা বেন-এর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। অ্যাফ্রা বেন নারীমুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, তুলনাহীন সাহস ও মনোবল এবং অসামান্য সৃজনী প্রতিভা নিয়ে (উপন্যাস, নাটক ও অনুবাদ) সমাজের সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হন।[৮] মননের এই উৎকর্ষ এদেশীয় মেয়েদের কাছে আশা করা অনুচিত। কারণ, অধিকারহীনতা বিষয়ে সচেতনতা ও অধিকার যে প্রাপ্য এবিষয়ে মূল্যবোধ গড়ে উঠবার জন্য অন্তত খানিকটা খোলা হাওয়া প্রয়োজন এবং শিক্ষা-স্বাধীনতার সেই খোলা হাওয়া থেকে এদেশের মেয়েরা একেবারে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং এদেশের নারী সাহিত্যে ক্ষোভবেদনার প্রকাশ আছে, আশা অভিলাষের বিবরণ আছে, কিন্তু প্রতিবাদী অথবা ঐতিহাসিক দর্শন নেই। মানবীবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রে বর্তমানে ব্যাপকভাবে নারীসমস্যা আলোচনার সূত্রে ক্রমে এই দর্শন গড়ে উঠছে। যেমন--ইণ্ডিয়ান উইমেন ঃ মিথ অ্যাণ্ড রিয়ালিটি (যশোধরা বাগচী সম্পাদিত), উইমেন অ্যাজ সাবজেকট্স (নীতা কুমার সম্পাদিত), ফ্রম দি সীমস অব হিস্ট্রি (ভারতী রায় সম্পাদিত), ডটার্স অব ইণ্ডিয়া, জেণ্ডার, কাস্ট অ্যাণ্ড ক্লাস ইন ইণ্ডিয়া (জোয়ানা লিড্ল অ্যাণ্ড রমা যোশী) ইত্যাদি।

নারী প্রগতি শব্দটি একটি ব্যাপক অভিধা, এর দুটি মুখ্য উপবিভাগ আছে। চেতনার স্তরে প্রগতিকে বলতে পারি নারীমুক্তি এবং অধিকারের স্তরের প্রগতিকে, স্ত্রী-স্বাধীনতা। বঙ্গদেশে দ্বিতীয় স্তরের নারী প্রগতি আসে সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় অনেকটা পুরুষেরই প্রয়োজনে। ইংরেজদের সঙ্গে সামাজিক স্তরে মেলামেশায় আলোকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাহচর্য বাঙালি ভদ্রলোকের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোক মানসিক ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনে এবং জীবনকে আনন্দময় করবার অভিপ্রায়ে শিক্ষিত ও মার্জিত স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এছাড়াও কিছু উদার, হৃদয়বান মানুষ ছিলেন যাঁরা প্রকৃতই নারীর হীন, অবনত অবস্থা দেখে দুঃখ অনুভব করেন ও এই অবস্থা নিরাকরণে উদ্‌যোগী হন। উভয় প্রকার মানুষের প্রচেষ্টার ফলেই নারী উন্নয়নের বিবিধ প্রয়াস গৃহীত হয়।

নারী প্রগতির অপর অংশটি নারী মুক্তি। স্ত্রী স্বাধীনতার সঙ্গে নারীমুক্তির পার্থক্য এই যে, স্ত্রী স্বাধীনতা বাইরে থেকে আরোপিত, নারীমুক্তি নারীর অন্তর্লোকের উজ্জীবন। নারীমুক্তি একটি সুনিশ্চিত ভাবনা ও সচেতন উপলব্ধি। এই ভাবনা ও উপলব্ধিতে সমস্যাটি বৃহত্তর মানবিক পটভূমিকায় স্থাপিত হয় এবং মানুষ হিসাবে সকলের সমান অধিকার-- এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়টি নারী চেতনায় পরিব্যাপ্ত হয়। অর্থাৎ নারীমুক্তি বিষয়টি নারীর নিজস্ব, তার আত্মসচেতন সত্তার জাগ্রত অংশ। নিজের সচেতন সত্তার উপলব্ধি, মানুষ হিসাবে নিজের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব অনুভব করা এবং এই উপলব্ধি-অনুভবের সার্থকতার পথে অন্তরায়সমূহকে সনাক্ত করা--- নারীমুক্তির প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই কিন্তু অনেক মেয়ের মধ্যে প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল। এই উপলব্ধি অনুভবের প্রতিফলন ঘটে তাঁদের বিবিধ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও পরে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ভিতর। কিন্তু সর্বাধিক প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে এবং আরো বেশি করে আত্মকথায়। আত্মকথা যেন আয়নায় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা অথবা নিজেকে উদ্‌ঘাটন করা।

নারীবাদী ইতিহাসরচনায় মেয়েদের আত্মকথার বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নারীবাদী ইতিহাস প্রথাগত ইতিহাসচর্চার অন্তর্গত নয়। প্রচলিত ইতিহাসে যেখানে নীরবতা, নারীবাদী ইতিহাসচর্চার শুরু সেখান থেকে। সুতরাং প্রচলিত ঐতিহাসিক দলিলের পরিবর্তে নারী -- ইতিহাস রচনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 'ডায়েরি, চিঠিপত্র, আত্মকথা, সাক্ষাৎকার, শ্রুতিনির্ভর সাক্ষ্যপ্রমাণ' ইত্যাদি।[৯] এছাড়াও মেয়েদের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সাহিত্য। এখানে সাহিত্য প্রকৃতই ইতিহাসের পরিপূরক। এক্ষেত্রে সাহিত্যের পাঠক ও সাহিত্যের স্রষ্টা— দুই দিক থেকেই আমরা নারীমানসকে আবিষ্কার করতে পারি। অতএব, লোকচক্ষুর অগোচরে আত্মগোপন করে থাকা কিংবা লোকচক্ষু দ্বারা অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকা উপাদান গুলিকে ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে নারীবাদী ইতিহাস তৈরী হয়।[১০]

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমসাময়িক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এবং নারীরচিত আত্মকথার ভিত্তিতে নারীর মনের মুক্তিভাবনার একটি সামাজিক দলিল বা নারীবাদী ইতিহাস প্রস্তুত করা। এই ক্ষেত্রে তিনটি আত্মকথাকে প্রতিনিধিস্থানীয় হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রথমটি রাসসুন্দরী দেবীর । তিনি একজন গৃহবধূ। দ্বিতীয় আত্মকথাটি নবযুগের আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মনারী লীলাবতী মিত্রর। এক্ষেত্রে লীলাবতীর ডায়েরি সহযোগে রচিত জীবনীটিও ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয় আত্মকথাটির রচয়িতা নটী বিনোদিনী--- জন্মসূত্রে ও কর্মসূত্রে যিনি সমাজের প্রান্তবাসী মহিলা।

বিদেশে সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে স্মৃতিকথা, দিনলিপি, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার ইত্যাদিকে মূল্যবান উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আমাদের দেশেও এই ধারা প্রচলিত হয়েছে এবং প্রথাগত দলিলের পাশাপাশি এইগুলি যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষত নারীবাদী ইতিহাস হচ্ছে প্রথাগত ইতিহাসচর্চার একটি সমান্তরাল ধারা এবং এই নতুন ধারায় আত্মকথা, ডায়েরি ও সাক্ষাৎকারকে ভিত্তি করে পরিচিত সমাজকে নতুন করে চেনার উদ্যম দেখা দিয়েছে। বর্তমান গবেষণায় এই ধারাকে অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীপ্রগতি বা নারীজীবনের উপর অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন--মেরেডিথ বর্থউইক রচিত 'দি চেঞ্জিং রোল অব উইমেন ইন বেঙ্গল', গোলাম মুরশিদ রচিত 'রিলাক্ট্যান্ট দেবুতাঁত', মালবিকা কার্লেকার রচিত 'ভয়েসেস ফ্রম উইদিন', সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী রচিত 'অন্দরে অন্তরে', ঊষা চক্রবর্তী রচিত 'কণ্ডিশন অব বেঙ্গলী উইমেন অ্যারাউণ্ড দি সেকেণ্ড হাফ অব দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি', প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বাংলার নারী জাগরণ', মীনাক্ষী রায় রচিত 'বেঙ্গলী উইমেন', শঙ্কর সেনগুপ্ত রচিত 'এ স্টাডি অব উইমেন ইন্ বেঙ্গল', এম. এম. আর্কুহার্ট রচিত 'উইমেন অব বেঙ্গল', কে বলহ্যাচেট রচিত 'রেস, সেক্স অ্যাণ্ড ক্লাস আণ্ডার দি রাজ', মালেকা বেগম প্রণীত 'বাংলার নারী আন্দোলন', গোলাম মুরশিদ প্রণীত 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া— নারী প্রগতির একশ বছর' প্রভৃতি। এর মধ্যে কতগুলির আলোচ্য

বিষয়বস্তু ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে নারীর সামাজিক অবস্থার ক্রমোন্নতি। অন্য গ্রন্থগুলিতে নারীর জীবনের কয়েকটি দিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মেরেডিথ বর্থউইকের গ্রন্থখানি প্রচুর তথ্য ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। কিন্তু গ্রন্থ খানির কেন্দ্রীয় বিষয় 'ভদ্রমহিলা'। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বঙ্গভঙ্গের পূর্ব পর্যন্ত কালসীমায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রনারীর জীবনযাত্রার ও মনোভাবের পরিবর্তনের ইতিহাস বর্থউইক রচনা করেছেন। যদিও এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 'ভদ্রমহিলা' সমাজের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী, কিন্তু সংখ্যায় তারা অতি ক্ষুদ্র। এই গোষ্ঠীর বাইরে যে বিপুল নারী সমাজ ছিল তাদের ইতিহাস বর্থউইকের গ্রন্থের এলাকাবহির্ভূত। অতএব, এই গ্রন্থটির অসামান্য মূল্য স্বীকার করেও বলা যায় যে বাঙালি নারীজীবনের একটি খণ্ডচিত্র এখানে উদ্‌ঘাটিত।

গোলাম মুরশিদের ইংরেজি গ্রন্থখানি মনোভঙ্গির ইতিহাসরচনায় একটি অতি মূল্যবান সংযোজন। এক হিসাবে গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে পথিকৃতের মর্যাদালাভের যোগ্য। বিশ্লেষণ ও তথ্যসংগ্রহের বিচারে বইখানি আকরগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্দশন হিসাবে গণ্য। কিন্তু এই বইখানিরও উপজীব্য শিক্ষিত ভদ্রমহিলা। সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁরা কতখানি ও কিভাবে সাড়া দেন এই গ্রন্থখানি সেই মনোভঙ্গি বিকাশের ইতিহাস। সুতরাং বইটি যদিও নারীজীবনের পরিবর্তনের ধারার ইতিহাস কিন্তু অনেকখানিই পুরুষনির্ভর। পুরুষপরিচালিত আন্দোলনের ইতিহাস নারীর বহিরঙ্গের ইতিহাস। অন্তরের নিজস্ব মুক্তিভাবনার বিবর্তনের ইতিহাস গোলাম মুরশিদের আলোচ্য বিষয় নয়। এই লেখকের 'রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া-নারী প্রগতির একশ বছর' পুস্তক খানি নারী প্রগতির একটি উৎকৃষ্ট ইতিহাস। কিন্তু কয়েকজন উচ্চ বর্ণের নারীর আত্মজীবনী ও জীবন বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রগতির ধারা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা হয়েছে বলে এই ইতিহাস সর্বাত্মক হয়ে ওঠেনি।

মালবিকা কার্লেকারের মূল্যবান গ্রন্থখানি আত্মকথার বিশ্লেষণেই রচিত। কিন্তু এই বইখানিও বহিরঙ্গের ইতিহাস এবং কয়েকজন ভদ্রমহিলার আত্মকথার ভিত্তিতে রচিত। সম্বুদ্ধ চক্রবর্তীর বইতে নানা ধরণের সাহিত্যিক উপাদান ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই বইয়ের সীমাবদ্ধতাও পরিস্ফুট, কারণ মাত্র শহুরে মধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্রমহিলার জীবন তাঁর গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র। মালেকা বেগমের গ্রন্থখানি বাংলার নারী আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিন্তু কোনো বিশেষ পর্ব বা দিকের প্রতি অতিরিক্ত আলোকপাত নেই।

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষ-পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনের ফলে মেয়েদের জীবনযাপন পদ্ধতি কিংবা বিভিন্ন ভূমিকাপালনে তাদের পরিবর্তিত রূপরেখা কিংবা সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে মেয়েদের সাড়া দেওয়ার ইতিহাসে নারী প্রগতির স্ত্রী স্বাধীনতার অংশটির বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু নারী প্রগতির যে অংশটি নারী মুক্তি-- নারীর নিজস্ব সচেতন ভাবনা ও উপলব্ধি, আত্মসচেতন সত্তার জাগরণ ও বিকাশ এবং এই বিকাশের পথের অন্তরায়গুলিকে প্রতিরোধ-- অর্থাৎ মেয়েদের মনের

'নিজস্ব' ইতিহাস-- এই গবেষণা তারই সন্ধান ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছে। এই উদ্দেশ্যে ঊনবিংশ শতকে রচিত প্রায় সমস্ত আত্মকথার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, জীবনী, স্মৃতি কথা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ইত্যাদিও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমসাময়িক সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, সরকারি নথিপত্রের সাহায্যও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সমসাময়িক সাহিত্য ও বিবিধ সামাজিক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিদেশী সামাজিক ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির সাহায্যও গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত নারীমুক্তিভাবনার ইতিহাস সংক্রান্ত বিদেশী প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি এই গবেষণার কার্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়টিতে ঊনবিংশ শতকের নারী উন্নয়ন প্রয়াসী সংস্কার আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে। কিভাবে নারী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিবারণ প্রয়াস ও সিভিলবিবাহ আইন পাস ইত্যাদি আন্দোলনের মাধ্যমে নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে প্রথমে এই প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত মূলসূত্র সহ আলোচিত হয়েছে। এইসঙ্গে একই অধ্যায়ে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও পর্যালোচনা করা হয়েছে। নারী উন্নয়নকামী এই সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্ব সবটাই পুরুষ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। আন্দোলনের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ পাশ্চাত্ত্যশিক্ষিত বা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত। কিন্তু কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও ঊনবিংশ শতকের মধ্য পর্বে প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মকথা তিনটির উপর ভিত্তি করে আলোচিত হয়েছে নারীর গার্হস্থ্যজীবনের রূপরেখা। গৃহবধূ, ব্রাহ্মনারী ও রঙ্গনটী— এই তিনজনের গার্হস্থ্যজীবনের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় ঐতিহ্যাশ্রিত অন্তঃপুরবাসী নারীর জীবনে গৃহস্থালিই প্রধান ভিত্তি। ব্রাহ্মনারীর সংসার পরম্পরাগত পরিবারের গৃহবধূর তুলনায় অনেকটাই পৃথক। অল্পবিস্তর ভূ-সম্পত্তি বা গ্রামীণ পেশানির্ভর ঐতিহ্যাশ্রয়ী পরিবারগুলির বিপরীতে প্রধানত চাকরি বা অন্য পেশানির্ভর ছিল ব্রাহ্ম পরিবারগুলি এবং অধিকাংশেরই বাস ছিল ছোট, মাঝারি বা বড় শহরে। তাছাড়া দূরবর্তী বা নিকটবর্তী যে কোনো ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে অন্য ব্রাহ্ম পরিবারের নিরন্তর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ, জানাশোনা এবং সহায়তা ইত্যাদির সূত্রে আত্মীয়তা বা আত্মীয়বৎ আচরণে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের ভিতরে যে কম্যুনিটি অনুভবের প্রকাশ দেখা যায়, জীবনযাপন পদ্ধতিতে তাও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। গৃহবধূর গৃহস্থালি যদিও শুধু শ্বশুরালয়কেন্দ্রিক, কিন্তু ব্যবস্থাটির অমানবিকতা ও পিত্রালয় এবং (জনক) জননীর প্রতি দায়বদ্ধতা প্রবলভাবে অনুভব করেন নারীমুক্তিভাবুক গৃহবধূ। অপরদিকে রঙ্গনটীর জীবনে পারিবারিকতা বা গৃহিণীত্ব প্রায় অনুপস্থিত।

পরিবর্তিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর জীবনে সর্বাধিক দৃশ্যমান রূপান্তর ঘটেছে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। কিন্তু গৃহবধূর অবরুদ্ধ জীবনেও সাংস্কৃতিক চেতনা ও সামাজিক মূল্যবোধ স্বতঃই সক্রিয় থাকে এবং অন্তঃপুরের অন্দরে অন্দরে

পরিব্যাপ্ত হয়। ব্রাহ্ম নারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা অনেকটা মুক্ত অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত। রঙ্গনটীর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পুরুষনিয়ন্ত্রিত থিয়েটারে অভিনেত্রীর অভিনয়দক্ষতা পণ্যদ্রব্যের ন্যায় লোভনীয় হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব বাঞ্ছনীয় নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আত্মকথাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নারীমুক্তিভাবনার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকবিবর্তনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ব্রাহ্ম আন্দোলন, রামকৃষ্ণ আন্দোলনের পটভূমিতে উপরন্তু আলোচিত হয়েছে নারীমনের ঈশ্বরভাবনার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দিকপরিবর্তনগুলি। কারণ গৃহবধূ ও ব্রাহ্মনারীর জীবনে তো বটেই, অভিনেত্রীর জীবনেও ধর্মপ্রেরণা এক বিরাট অস্ত্যর্থক শক্তিরূপে বিরাজ করে।

পঞ্চম অধ্যায়ে মেয়েদের নিজস্ব ও আন্তরিক প্রগতিপন্থা ও সমাজের বৃহত্তর স্থবির মানসিকতার বিপরীতে নারীমুক্তিভাবনার গতিশীলতার স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। দেখা যায় যে গৃহবধূ ও ব্রাহ্মনারীর মধ্যে দায়িত্ব ও ভূমিকাপালনে তারতম্য আছে, সামাজিক অবস্থানও উভয়ের প্রায়ই এক ভূমিতে নয়। অভিনেত্রীর অবস্থান সমাজের প্রান্তদেশে। কিন্তু মুক্তিভাবনায় ও মানসিক প্রগতিপন্থায় অভিনেত্রী কারো তুলনায় ন্যূন নন। সমকালকে প্রভাবিত করা ও উত্তরকালের জন্য ঐতিহ্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এই তিন পর্যায়ের নারী তিনভাবে সফল হন। আরো লক্ষ্য করা যায় যে বঙ্গদেশে নারীমুক্তিভাবনার এই পথিকৃৎগণ বহু আগে কাজ শুরু করলেও এবং এই ক্ষেত্রে ক্রমিক অগ্রগতি হলেও সামাজে এখনো তার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্যণীয় নয়। তবু পুরুষরচিত ও পুরুষপ্রধান প্রথাগত ইতিহাসের সমান্তরাল এই নারী ইতিহাস সুনিশ্চিতভাবে গৌরবজনক ও উৎসাহপ্রদ।

সূত্রনির্দেশ

১. G. M. Trevelyan, English Social History, london, 1958, p. 584

২. আগস্ট বেবেল, নারী– অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে, অনুবাদ,কনক মুখোপাধ্যায় কলিকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ২৪

৩. Joan Kelly, Women, History and Theory, Chicago, U.S.A. 1968, pp. 27-31, 67.

৪. G. M. Trevelyan, op. cit. No. 1, p. 472

৫. Ibid, pp. 486-487, 548-549.

৬. Joan Kelly op. cit. No. 3, p. 66

৭. Mary R. Beard, Woman as Force in History, New York, 1962, pp 105-108

৮. ঊর্মিলা চক্রবর্তী, 'সামাজিক মূল্যবোধ বনাম মহিলা সাহিত্য', 'জিজ্ঞাসা' সংকলন, শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ ২২৮-২৩৪

৯. মালিনী ভট্টাচার্য, 'মেয়েদের ইতিহাস ও সাহিত্যের সাক্ষ্য'। ভারত ইতিহাসে নারী, রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ১১০-১১৭

১০. যশোধরা বাগচী, নারীবাদী দৃষ্টভঙ্গিতে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য, তদের পৃ ১১৯-১২৭